SYNOPSIS

Nirendranath Chakrabartir Kabita : Bishleshan o Mulyayan

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

Scholar

SIMA PURKAIT

Registration Number : R–18RS02220157

Date of the Registration : 25/09/2019

Department of Bengali

Presidency University of Kolkata

9748504887, simapurkait9748@gmail.com

Supervisor

Shaon Nandi 31.05.25

DR. SHAON NANDI

Associate Professor

Dept. of Bengali

Presidency University,

Kolkata, India

Dr. Shaon Nandi
Associate Professor
Department of Bengali
Presidency University

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা :		১
প্রথম অধ্যায় :	আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ও চারের দশক	৩
দ্বিতীয় অধ্যায় :	নীরেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি	৬
তৃতীয় অধ্যায় :	নীরেন্দ্রনাথের সমকালীন কবি ও কবিতা (সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ)	৮
চতুর্থ অধ্যায় :	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা জগতের বিশ্লেষণ : (ক) বিষয়গত (সময়-সমাজ-মানুষ, মৃত্যু-চেতনা, প্রেম-ভাবনা, ছড়াকার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রকৃতি-চেতনা) (খ) আঙ্গিকগত (ভাষা ও রীতি, ছন্দ, চিত্রকল্প)	১১
পঞ্চম অধ্যায় :	আধুনিক কবিতার ধারায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার সামগ্রিক মূল্যায়ন	২২
উপসংহার :		২৪
গ্রন্থপঞ্জি :		২৫

প্রস্তাবনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূত্রপাত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই রাজনৈতিক অবক্ষয়কে, সমাজজীবনের ভাঙনকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল। এই সময়ের প্রায় সকল কবির কবিতাতেই এই অস্থির সময়ের প্রতিফলন স্পষ্ট, বিশেষ করে তিনের ও চারের দশকের কবিদের কবিতায়।

আমরা আধুনিকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করেছি প্রথম অধ্যায়ে। আধুনিক কবিতা বলতে কি কেবল আধুনিক সময়ে লেখা কবিতাকেই বোঝায় অর্থাৎ, ইতিহাস যাকে কালের বিচারে আধুনিক যুগ অ্যাখ্যা দিয়েছে, আধুনিক কবিতা বলতে কি কেবল সেই সময়কালে লেখা কবিতাকে বোঝায়? আধুনিকতা কি কোনো সুনির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ? কেউ কেউ এইরূপ মত পোষণ করলেও, অনেক মনীষী আবার তা মানতে নারাজ। তবে, "শুধুই সমকালীনতা 'আধুনিক'-এর উপাস্য হতে পারে না, সমকালীনের মধ্য দিয়ে চিরায়তের (যাকে দার্শনিকেরা বলেছেন 'transcendental') অন্বেষণ—সেও প্রকৃত আধুনিকতার অনিষ্ট।"[১]

আধুনিক বাংলা কবিতার যে কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রথম অধ্যায়টির গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে আমরা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পূর্বজ কবিদের কাব্যচেতনা নিয়েও আলোচনা করেছি। কারণ বাংলা কবিতার আধুনিকতার প্রকৃত স্বরূপকে বুঝতে গেলে আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের প্রতিও দৃষ্টি-নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। "...যদি বাংলা কবিতাকে একটা স্রোতধারা বলে ভাবি, অনেকবারই এই স্রোতধারা খাতবদল করেছে। অনেকবার। অসংখ্যবার। শেষ মস্ত বড় খাতবদলের কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। একটা বিরাট রকমের বদল হয়ে গেল। যেমন কবিতার ভাষায়, তেমনি কবিতার ভাবনায়। ভাবনায়

বলতে এখানে আমি বিষয়-বস্তুর কথাও বলছি।...তারপরে তিরিশের দশকে একটা বদল হল। তিরিশের কবিরা সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে—সকলেই ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। এঁদের কবিতা ইংরেজি কবিতার দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত। এঁরা বাংলা কবিতার প্রবহমান ধারা থেকে সরে গেছেন। তিরিশের কবিরা কিন্তু সকলেই ইংরেজি কাব্যধারার দ্বারা বড্ড বেশি প্রভাবিত। জীবনানন্দও ব্যতিক্রম নন। তবে এই সময়ের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশকে আলাদা করে ধরি এই কারণে যে, তিনি একটি স্বতন্ত্র কাব্যভাষা সৃষ্টি করেছিলেন।"[২]

চারের দশক ছিল প্রধানত বামপন্থী উজ্জীবনের দশক। চারের দশকের প্রধান কবিরা ছিলেন সাম্যবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী। তাঁদের কবিতায়ও সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। এই দশকেরই অন্যতম প্রধান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও তৎকালীন অস্থির সময়ের ছবি এঁকেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। কিন্তু চারের দশকের অন্যান্য প্রধান কবিদের মতো তাঁর কবিতায় কোনোরকম রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রতিফলন পাওয়া যায় না। কোনো দলীয় রাজনৈতিক শ্লোগানে মুখরিত হয়নি তাঁর কবিতা। ব্যক্তিজীবনেও তিনি রাজনৈতিক দলের সংস্রব থেকে দূরে থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।

তথ্যসূত্র :

১. পিনাকেশ সরকার, "আধুনিকতার স্বরূপ", 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা : ৫৫

২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকার, 'কোরক', বইমেলা ১৪১৮, পৃষ্ঠা : ১৮১-১৮২

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ও চারের দশক

আধুনিক বাংলা কবিতার যে কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রথম অধ্যায়টির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বাংলা কবিতার আধুনিকতার প্রকৃত স্বরূপকে বুঝতে গেলে, কেবল চারের দশকের কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের প্রতিও দৃষ্টি-নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই আমরা আধুনিকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ে। আধুনিক কবিতা বলতে কি কেবল আধুনিক সময়ে লেখা কবিতাকেই বোঝায় অর্থাৎ, আধুনিকতা কি কোন সুনির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ? — কেউ কেউ এইরূপ মত পোষণ করলেও, অনেক মনীষী আবার তা মানতে নারাজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্নয়’[১] করতে নারাজ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে নতুন একটি কবিতার ধারা গড়ে উঠতে শুরু করল ‘কল্লোল’ (১৯২৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বসভ্যতার বিপর্যস্ত পরিস্থিতি এই সময়ের কবিদের ভীষণ রকমে আলোড়িত করেছিল। কল্লোলের পরে প্রকাশিত ‘উত্তরা’ (১৯২৫), ‘কালিকলম’(১৯২৬), ‘ধূপছায়া’(১৯২৭), ‘প্রগতি’(১৯২৭), ‘পরিচয়’ (১৯৩১) ও ‘কবিতা’(১৯৩৫) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে তরুণ কবিগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল, তাঁরা ইউরোপীয় সাহিত্য-প্রেরণায় বাংলা কবিতাকে একটা নতুন খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। বাংলা কবিতায় বাঁক ফেরার একটা লক্ষণ স্ফুটিত হয়েছিল মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসাধনায়, “আমার বিশ্বাস যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং নজরুল ইসলামকে লইয়া আমাদের আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায় আরম্ভ।”[২] কবিতায় বিদ্রোহী-প্রতিবাদীর ভূমিকায়

অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের পথ ধরেই আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলন আরো গভীরতর হয়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে। ইউরোপের নানা সাহিত্য আন্দোলন ও জীবনাদর্শের আলোকে কবিতা লিখতে শুরু করেন এই সময়ের সমস্ত প্রধান কবিরা — বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

তিনের দশকের বাঙালি কবিরা সময়-সচেতন হলেও তাঁদের কবিতায় সমাজ-মনস্কতার প্রকাশ ঘটলেও তাঁরা সচেতনভাবে সাম্যবাদের শরিক হতে পারেন নি। মার্কসীয় সাম্যবাদী ভাবধারার সর্বাধিক প্রসার ঘটে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে। আমরা জানি, চারের দশক ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার চরম উত্তাল মুহূর্ত। একাধারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মহামন্বন্তর, ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলন, সেইসঙ্গে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ, সবমিলিয়ে গোটা চারের দশক হয়ে উঠেছিল সমাজ ও জীবনের অভিশাপ। আর ছিল বুর্জোয়া-শক্তির ভয়ংকর দাপাদাপি। যা সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সেই সংকট থেকে মুক্তির পথ খুঁজতেই এই সময়ের বহু কবি সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি আস্থাবান হয়ে ওঠেন। শোষক শ্রেণির সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করতে চেয়েছিলেন এই সময়ের কবিরা। তাঁদের চোখে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সমান অধিকার প্রদান। এই ধারার প্রধান কবিরা হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই চারের দশকেই পথচলা শুরু করেছিলেন আরো এক বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। চারের দশকের অন্যান্য প্রধান কবিদের মতই তাঁর কবিতাও ছিল কালচেতনা—সমৃদ্ধ। এই সময়ের প্রধান কবিদের মতো তিনি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বমূলক কবিতা লেখেননি

এবং ব্যক্তিজীবনেও তিনি ছিলেন দলীয় রাজনীতি থেকে বহুদূরে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভারতের সমাজ, রাজনীতি যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং তা কবিকে কীভাবে বিচলিত করেছিল, তাঁর একাধিক কবিতায় তার প্রকাশ চোখে পড়ে। 'চল্লিশের দিনগুলি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটিতে কবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর ইত্যাদির বিধ্বংসী রূপকে তুলে ধরেছেন। অপর একটি কবিতার ধারাও এই সময় গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। তা হল, আত্মমগ্ন কবিতার ধারা। পাঁচের দশকের কবিতায় যা আরো বিকশিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আধুনিক কাব্য", 'সাহিত্যের পথে', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৩

২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, "কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়", সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীরেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবর, অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে।[১] তাঁর শৈশব-শিক্ষার হাতে খড়ি ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার কাছে। এরপর পাঁচ ছয় বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ।[২] সেখানেই শুরু হয়েছিল তাঁর প্রথাগত শিক্ষা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীলনির্জন', ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] 'অনন্ত গোধূলিবেলা' (২০০৮) তাঁর শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এছাড়া তিনি প্রচুর ছড়াও লিখেছেন ছোটদের জন্য। তাঁর ছড়ার বই রয়েছে মোট আঠারোটি।

কবির প্রথম লেখা 'নৌকা চলে' নামক একটি কবিতা, যেটি বিদ্যালয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন কবি সম্ভবত সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।[৪] তবে কবি হিসেবে তাঁর প্রথম খ্যাতি এনে দিয়েছিল 'শহীদ রামেশ্বর', ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৫]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সময়—সচেতন কবি। সমকালীনতার প্রেক্ষিতে তিনি কবিতা যেমন লিখেছেন, সেরকম তাঁর গদ্য—প্রবন্ধ রচনাগুলিতেও তার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধধর্মী রচনাগুলি হল, 'কবিতার ক্লাস', 'কবিতার দিকে', 'কবিতার কী ও কেন', 'রবীন্দ্রনাথ ও আমরা' ইত্যাদি। এছাড়া তিনি লিখেছেন আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'নীরবিন্দু'। প্রথম খণ্ডে রয়েছে, কবির শৈশব জীবন থেকে শুরু করে স্কুল জীবন পর্যন্ত ঘটে পাওয়া ছোট বড় সমস্ত ঘটনার নিখুঁত বিবরণ। আর দ্বিতীয় খণ্ডে কবি দেখিয়েছেন, স্কুল জীবন শেষ করে তিনি কলেজ জীবনে পা রাখছেন। আর পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত হচ্ছেন। এছাড়া সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন কবি এই খণ্ডে।

তথ্যসূত্র :

১. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ‘নীরবিন্দু’ (অখণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৯

২. তদেব, পৃ. ৩০

৩. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, “নিজের কথা নিজের বয়ানে”, ‘কোরক’, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, পৃ. ২০২

৪. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকার, ‘লালপরি নীলপরি’, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শিশুসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-১৬, ১৪২৪, পৃ. ৩৪৭

৫. কল্যাণ মণ্ডল, “সাক্ষাৎকার : কবিতাই আমার মাতৃভাষা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী”, 'কোরক', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, পৃ. ১৭০

তৃতীয় অধ্যায়

নীরেন্দ্রনাথের সমকালীন কবি ও কবিতা

যদিও আমাদের গবেষণার বিষয় 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন,' কিন্তু তাঁর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, পরিপূর্ণ একটা ধারণা পেতে গেলে তাঁর সমসাময়িক কবিদের কথাও তুলে ধরা জরুরি। তা না হলে আলোচনাটি সম্পূর্ণ ও যথার্থ হবে না। চারের দশকের বাংলা কবিতার প্রধান ধারাটি সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা পুষ্ট। এই ধারার প্রধান কবিরা হলেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস প্রমুখ।

চারের দশকের সমাজমনস্ক সাম্যবাদী কবিতার ধারাটি আজও মানুষের দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়নি। কারণ এঁরাই দেখাতে চেয়েছিলেন মানবমুক্তির পথ। সারা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদীদের ভয়ঙ্কর উত্থান, বুর্জোয়ারা প্রতিটা মুহূর্তে সাধারণ দুর্বল মানুষকে গিলে খাচ্ছে, চতুর্দিক শ্রেণিসংগ্রামে উত্তপ্ত, এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁদের মন প্রেম ও সৌন্দর্য ভাবনার কবিতা রচনা করে পলায়নবাদী অ্যাখ্যা পেতে চায়নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
> ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
> চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
> কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।" ("মে দিনের কবিতা", 'পদাতিক')

আকাশের চাঁদ, প্রজাপতি, ফুলের প্রতি মোহকে তিনি 'বুর্জোয়াদের মায়া' বলেছেন 'পদাতিকে'র 'সকলের গান' কবিতায়। তাঁর সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য, "...তিনি বোধহয় প্রথম বাঙালি

কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষণীয় ছিলো।”[১]

সমর সেনের কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার সাধারণ পার্থক্য হল, সমর সেনের কবিতায় নৈরাশ্যচেতনা প্রবল। এজন্য তাঁকে মার্কসবাদীদের রোষের মুখেও পড়তে হয়েছিল। যদিও তিনি বলেছেন —

“আমি রোম্যান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট।” (সমর সেন, “২২ শে জুন”, ‘তিনপুরুষ’)

চল্লিশের দশকে কেবল সমাজ-মনস্ক কবিতাই রচিত হয়নি, ব্যক্তি-হৃদয়ের আবেগের কবিতাও রচিত হয়েছে। এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে অশোক বিজয় রাহার নামটি সর্বপ্রথম মনে আসে। কিন্তু প্রকৃতিমগ্ন ও আত্মমগ্ন এই কবির মন জীবনের সামাজিক সত্যগুলি থেকেও বিচ্ছিন্ন নয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ডিহাং নদীর বাঁকে’র ‘চিঠি’ রোমান্টিক কবিতা হলেও সমাজ বাস্তবতার রূপ ফুটে উঠেছে। লিখেছেন,

“আমি শুধু জানি আজ এ জ্যোৎস্না – রাতে -

কত কচি ডালে ফুলের প্রসব – ব্যথা, - কুমারীর

বুকে যন্ত্রণা দিয়ে - জন্ম নিতেছে প্রেমের কুঁড়ি - ...।” (“চিঠি”, ‘ডিহাং নদীর বাঁকে’)

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চাপে জীবন-যৌবন-প্রেমস্বপ্ন পর্যুদস্ত, ভীতসন্ত্রস্ত। তিনি প্রধানত আত্মমগ্ন কবি হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে চলতে পারেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক হিটলারের বর্ণনা রয়েছে তাঁর ‘রক্তসন্ধ্যা’ গ্রন্থের “যুগসন্ধি’ কবিতায়।

সবশেষে এটুকু বলতে পারি, ‘চল্লিশের কবিতায় প্রাণের স্পন্দন ছিল অকৃত্রিম, তা বিদ্রোহের বাণীই হোক, পুঁজিবাদের প্রতিরোধী সংকল্পই হোক, অথবা স্বর্ণাভ সন্ধ্যা বা ভালোবাসার স্মৃতিই হোক — কোথাও কবিরা যেন খুব বেশি বানিয়ে তুলে কোনো শব্দ নির্মাণ করতে যাননি।’[২]

তথ্যসূত্র :

১। বুদ্ধদেব বসু, “সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক”, ‘কালের পুতুল’, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯ জানুয়ারি, নিউ এজ সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬, পৃষ্ঠা – ৮০

২। সুমিতা চক্রবর্তী, “চল্লিশের কবিতা”, ‘আধুনিক কবিতার ইতিহাস’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১৫৬

চতুর্থ অধ্যায়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা জগতের বিশ্লেষণ

(ক) বিষয়গত

সময়-সমাজ-জীবনবোধ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সারাজীবনে কবিতার পাশাপাশি প্রচুর গদ্য-প্রবন্ধও রচনা করেছেন। কিন্তু কবিতাই ছিলো তাঁর প্রধান ভালবাসার জায়গা। কবিতা কেবল ব্যক্তি—অনুভূতির বিষয় নয়, সমগ্র সমাজকে নিয়েই তার কারবার। চারের দশকের অন্যান্য কবিদের মতো তিনিও সমকালীন সমাজের ছবি এঁকেছেন কবিতায়। একাধিক কবিতায় সমকালীন সমাজ ও সভ্যতার বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত রূপটিকে তুলে ধরেছেন কবি, যেখানে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু গ্রাস করতে আসে। কলুষিত সময় ও সমাজের প্রত্যক্ষ দর্শক নীরেন্দ্রনাথের ব্যথিত হৃদয় উচ্চারণ করেছে —

মনে হয় আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি

নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে

যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে

যেখানে তাকাই — শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। (“মৌলিক নিষাদ”, ‘অন্ধকার বারান্দা’)

কবির পরিচিত আলোর জগৎটি কেমন যেন অচেনা অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। একাকিত্ব, হতাশা গ্রাস করে চলেছে। সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটে জীবন দুর্বিষহ।

চেনা আলোর বিন্দুগুলি

হারিয়ে গেল হঠাৎ —

এখন আমি অন্ধকারে, একা।

চারদিকে চার — দেয়াল, চোখের দৃষ্টি নিভে আসে,

শিউরে উঠি অন্ধকারের কঠিন পরিহাসে। (“দেয়াল”, ‘অন্ধকার বারান্দা’)

তাঁর কবিতায় নৈরাশ্য—চেতনা যেমন রয়েছে, একইসঙ্গে প্রতিবাদী চেতনায়ও মুখর তাঁর বহু কবিতা। শুরু থেকেই তাঁর কবিতা প্রতিবাদী। ১৯৪৫ খ্রিঃ ২১ শে নভেম্বর ছাত্র-মিছিলে পুলিশের গুলিতে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১] মৃত্যুতে লেখা তাঁর প্রথম জনপ্রিয় কবিতা ‘শহীদ রামেশ্বর’ থেকেই তাঁর প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

ক্ষমতার আস্ফালনে মানুষ যখন নিজের স্বাভাবিক বোধ-রুচিকে বিসর্জন দেন, তখন মূল্যবোধ-বিবর্জিত কিছু সুবিধাবাদী মানুষ নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে তার উমেদারী করে থাকেন কিংবা সমস্ত কিছু উপলব্ধি করেও শাস্তির ভয়ে মুখের ওপর সত্য কথা বলতে পারেন না, সেই সমস্ত ভীরু মনোভাব-সম্পন্ন মানুষদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন কবি উলঙ্গ রাজা কবিতার মধ্য দিয়ে। ‘উলঙ্গ রাজা’ কবিতায় একইসঙ্গে ফন্দিবাজীর নির্মমতা ও যুগ-যন্ত্রণার করুণ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। সমস্ত কবিতা জুড়ে কবি সত্যবাদী, সরল ও সাহসী এক শিশুকে অন্বেষণ করেছেন, যে রাজার সামনে রাজার মুখের ওপর বলতে পারবে ‘রাজা তোর কাপড় কোথায়?’

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী তার বহু কবিতার প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা ‘চল্লিশের দিনগুলি’ কবিতাটির কথা উল্লেখ করতে পারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, ১৯৪৬-এর সম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তার মূল্যে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা ও দেশভাগ — এ সমস্ত কিছুর অনুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁর ‘চল্লিশের দিনগুলি’ কবিতাতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বিপর্যয় কেবল চারের দশকেই থেমে থাকেনি। সাতের দশকের রক্তাক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কবি লিখেছেন —

বৃক্ষেরা আমূল কাঁপে, ভয়ার্ত পাখিরা

ঝাঁকে-ঝাঁকে

বিপন্ন আশ্রয় ছেড়ে রাত্রির আকাশে উড়ে যায়। ("কবিতা '৭০", 'উলঙ্গ রাজা',)

এছাড়া ভোট-সর্বস্ব রাজনীতির করুণ বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন কবি তাঁর কয়েকটি কবিতায়। এই প্রসঙ্গে 'ভোটার', 'ঘরপোড়া মানুষগুলো', 'জলের জেলখানা থেকে', 'না রাম না গঙ্গা' ইত্যাদি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি কবিতায় দেখা যায় দর্মার ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর ঘরপোড়া মানুষগুলো ঘোর বর্ষাকালে একবস্ত্রে মাঠের মধ্যে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলে তারা কোথায় যাবে, তার জবাবে জনপ্রতিনিধি জানায় —

"আমরা ভোট জানি, আমরা নির্বাচন জানি।" ("ঘরপোড়া মানুষগুলি", 'সাকুল্যে তিনজন')

দেশের মূল সমস্যাগুলো থেকে জন-মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখতে রাষ্ট্র চিরকাল ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা 'সত্য সেলুকাস' কবিতাটির কথা উল্লেখ করতে পারি, যেখানে মন্দির-মসজিদ দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে।

সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী, সমাজ ও জীবনে তার কুপ্রভাব সম্পর্কিত কবিতা লিখলেও দলীয় রাজনীতির প্রচার তিনি কখনও করেননি। বলেছেন, "রাজনৈতিক কবিতা বলে কিছু হয় না, দলীয় কবিতা কেমন? ধরো, আমি কোনও একটা বিষয়ে 'হ্যাঁ' বলতে চাইলাম, পেছন থেকে দল বলল, ওটাতে 'না' বলো। তা-ই বলতে হল। কোনও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি অনুরাগ থাকতে পারে। কিন্তু তা-ই বলে রাজনৈতিক দল? কক্ষনো নয়। দলই কবিকে চুষে খেয়ে ছিবড়ে করে ছাড়বে।"[২]

প্রকৃতিচেতনা : কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম শৈশব কেটেছে পল্লী-প্রকৃতির সান্নিধ্যে। পূর্ব বাংলার মানুষ তিনি। কাজেই তাঁর লেখনীতে প্রকৃতি-মুগ্ধতা সহজাতভাবেই ধরা পড়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে কে না মুগ্ধ হয়? প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করতে আকাশকে নারীরূপে কল্পনা করেছেন কবি “লালদিঘিতে বৃষ্টি” কবিতায়। শরতের সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ‘এই আশ্বিনে’ কবিতায়। তবে ‘বিশুদ্ধ প্রকৃতি বা প্রেম তেমনভাবে কোনোকিছুই তাঁকে টানেনি। তাঁর কবিতার অন্যতম বিষয় মানুষ, সমাজ-পারিপার্শ্বিক ঘটনা, পারিপার্শ্বিক জুড়ে তিনি শুনতে পান ভাঙনের শব্দ।’[৩] রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত কবি লিখছেন —

পিতামহ তোমার আকাশ

নীল — কতখানি নীল ছিল?

আমার আকাশ নীল নয়। (“মৌলিক নিষাদ”, ‘অন্ধকার বারান্দা’)

জীবনে যখন ক্লান্তি, হতাশা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে রোমান্টিক অনুভূতি জাগ্রত হয় না। আকাশকেও তখন আর নির্মল মনে হয় না। তবে কবি আশাবাদী।

ভরদুপুরে, পলাশ, আমি

তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি।

...দিনদুপুরে বিশ্ব জুড়ে

টকটকে লাল সিঁদুর জ্বলুক। (“রক্তপলাশ”, ‘অন্য গোপাল’)

লাল পলাশের দিকে তাকিয়ে কবি দিন বদলের স্বপ্ন দেখেন। অতএব বোঝা গেল, তাঁর প্রকৃতি-চেতনা শুধুই সৌন্দর্য-চেতনার উৎসার ঘটায় না, সমাজ-সত্যের কথাও বলে।

মৃত্যুচেতনা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুচেতনামূলক কবিতায় মৃত্যু—যন্ত্রণার তীব্রতা নেই। জন্ম থাকলে মৃত্যুও থাকবে, মৃত্যুকে তিনি জীবনেরই একটি সম্পূরক অধ্যায় বলে মনে করেন। বার্ধক্যে পৌঁছানোর পর মানুষের চেতনায় অনায়াসে ঢুকে পড়ে মৃত্যুভাবনা। কবি বুঝতে পারছেন, সময় বড় কম। কলিং বেল বেজেই যাচ্ছে। কিন্তু তিনি এখনই যেতে চান না। আরও কিছু সূর্যোদয় দেখে যেতে চান কবি।

এখনও মরিনি, বেঁচে আছি।

আরও কিছু সূর্যোদয় দেখবার মানসে এই বাঁচা। ("আরও কিছু সূর্যোদয়", 'সত্য সেলুকাস')

তিনি যেহেতু সমাজ—মনস্ক কবি, মানুষের কবি, তাই তাঁর মৃত্যুভাবনাও সমাজ ও মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দুঃস্থ সময়ের চিত্রকার এই কবি সমাজের আলোকোজ্জ্বল রূপটি না দেখে কোথাও যেতে চান না।

যাবার সময় হল, তা কি আমি জানি না? তবুও

সত্যি করে বলো,

সকালের মুখখানি না-দেখে

অন্ধকারে এইভাবে এক্ষুনি কেউ চলে যেতে পারে? ("এইভাবে কি যাওয়া যায়", কবিতা সমগ্র ৬)

প্রভাতের মুখ না দেখে অন্ধকারে তিনি কোথাও যেতে চান না। অতএব কবি আশাবাদী যে সমাজ একদিন অন্ধকার—মুক্ত হবে।

যেতে চায়না মন, কিন্তু যেতেই হবে। কবি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন, পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত স্নেহ-মায়ার বন্ধন ফুরিয়ে আসছে। কারণ রোগযন্ত্রণার জ্বালা নেবানোর শক্তি তাঁর নেই। রোগযন্ত্রণার চেয়েও বড় জ্বালা হল তাঁর ভালোবাসার পৃথিবীকে অসুস্থ অবস্থাতেই ফেলে রেখে বহুদূরে চলে যেতে হবে তাঁকে।

পৃথিবী, তোমার জন্যে বড় বেশি ভালোবাসা ছিল।

তোমাকে সুস্থতা দেব, আশা ছিল।

কিন্তু আমি কোনো রোগযন্ত্রণার জ্বালা

নেবাতে পারি না। ("শুধু সান্ত্বনার কথা", 'নক্ষত্র জয়ের জন্য')

প্রেমভাবনা : কবিতা লিখতে লিখতে কবিতার সঙ্গে কবির এক চিরন্তন ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। জীবনের কঠিন মুহূর্তে ব্যক্তি যখন দিশাহীন আশ্রয়হীন, কবিতাই তখন বাঁচার অবলম্বন হয়ে ওঠে।

আমি পাহাড় থেকে পড়তে পড়তে

তোমাকে ধরে বেঁচে রয়েছি কবিতা।

আমি পাতালে ডুবে মরতে মরতে

তোমাকে ধরে আবার ভেসে উঠেছি। ("নিজের কাছে স্বীকারোক্তি", 'নক্ষত্র জয়ের জন্য')

ভালোবাসা সেটাই যা সকল মানুষের দুঃখে একটু আলোর দিশা দেখাতে পারে।

ঠাকুমা বলতেন, ওই সূর্যটাকে ছিঁড়ে

এনে যে লণ্ঠন জ্বালতেন দুঃখীর কুটিরে

তার নাম ভালবাসা। ("বিরহ, এবং", 'কবিতার বদলে কবিতা')

অসুস্থ পৃথিবীর প্রতি, মানুষের প্রতি কবির ভালোবাসা প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসার সমগোত্রীয়। "তাঁর কাব্যের প্রধান সুর প্রেম বা ভালোবাসা। যা নারী থেকে প্রকৃতি ও মানুষে পরিব্যাপ্ত।"[৪]

ছড়াকার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : কবির স্বীকারোক্তি, "আমি বড়দের জন্য যতো কবিতা লিখেছি, ছোটদের জন্য ছড়া বোধহয় তার চেয়ে কিছু কম লিখি নি। আসল কথা ছোটদের আমি ভালোবাসি। আর এই কথাটা সারাক্ষণই আমার মনের মধ্যে জেগে থাকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত-না ছোটদের জন্য কলম ধরছি, ততোক্ষণ আমার কলম শুদ্ধ হচ্ছে না।"[৫] বিখ্যাত শিশু-কিশোর পত্রিকা 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালে তিনি 'আনন্দমেলা'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"[৬]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়াগুলো পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে মজার ছলে তিনি আসলে শিশুশিক্ষার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন ছড়ার মাধ্যমে। বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, পশু, পাখি, মাঠ-ঘাট,নদী-নালার বর্ণনা থেকে শুরু করে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, এছাড়া নানা সামাজিক সমস্যা, কুসংস্কার, বিজ্ঞান ও পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে ছড়া লিখেছেন।

(খ) আঙ্গিকগত

ভাষা ও রীতি : রচনারীতির মধ্য দিয়ে রচয়িতা তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন। একজন কবিকে অপর কবিদের থেকে পৃথক করে তোলে তাঁর নিজস্ব কাব্যভাষা, শব্দচয়ন কৌশল, বাক্-ভঙ্গি

ইত্যাদি। কবিতায় তিনি যে শব্দ, ভাষা ব্যবহার করে থাকেন তা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত মুখের ভাষা। শব্দের ব্যবহারে কোনোরকম গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। তিনি আটপৌরে, তৎসম সমস্ত রকম শব্দকেই গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন কবিতায়, "আটপৌরে এবং তৎসম সবই জরুরি। নাহলে কবিতা দাঁড়ায় না। তৎসমও ব্যবহার করতে হবে। দেশজ শব্দও প্রচুর ব্যবহার করতে হবে। আর তদ্ভব তো ব্যবহার করতে হবেই। তৎসম-তদ্ভব-দেশজ তিন রকমের শব্দের কোনোটাই মূল্যহীন নয়।"[৭]

তাঁর কবিতায় লোকচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, রূপকথার গল্প ইত্যাদি বিষয়কে তিনি কবিতার উপাদান করে তুলেছেন।

কবিতায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে কবির দক্ষতা অসামান্য। সাম্যবাদী কবি স্বপ্ন দেখতেন, শ্রেণি-বৈষম্য দূর হোক, দারিদ্র্য দূর হোক সমাজ থেকে। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার বদলে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য আরও বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে 'হাড়ে দুব্বো গজানো' প্রবাদটি তাঁর কবিতায় কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, সেটা আমরা দেখবো।

তেত্রিশ বছর প্রতীক্ষায় থাকতে-থাকতে হাড়ে

দুব্বো গজাবার বেশি বাকি নেই।("চতুর্দিক অন্ধকার", 'পাগলা ঘন্টি')

তেত্রিশ বছর ধরে প্রতীক্ষার পরও যখন কবি দেখলেন সাম্য প্রতিষ্ঠার বদলে শ্রেণি-বৈষম্য আরও বেড়েই চলেছে তখন চরম বেদনা থেকে কবি 'হাড়ে দুব্বো গজানো'র প্রসঙ্গ এনেছেন।

গদ্যরীতি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার অন্যতম একটি উপাদান। কলকাতার বন্যাকে গদ্যরীতির আধারে অসাধারণ কাব্যিক রূপ দিয়েছেন কবি 'হ্যালো দমদম' কবিতায়। কবিতাটি লেখা হয়েছে গল্পকথন রীতিতে। গদ্যরীতি, গল্পকথনভঙ্গি চল্লিশের দশকের কবিতার অন্যতম

বৈশিষ্ট্য। তাঁর বহু কবিতা আছে যেখানে আত্মকথন ও গল্পকথনের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁর আত্মজীবনীমূলক কবিতা ‘রূপ-কাহিনী’ ও ‘খড়ির দাগ’ কবিতা দুটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এই দুটি কবিতায় শৈশবের স্মৃতিকে বর্ণনা করেছেন তিনি।

ছন্দ : কবিতায় যেমন কবির জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি একটি কবিতার নির্মাণে আঙ্গিকগত দিকটাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা ও রীতির মতো কবিদের নিজস্ব ছন্দবোধ থাকে যা একজন কবিকে স্বাতন্ত্র্যতার মর্যাদা দান করে। কবিতার ছন্দ নিয়ে খুব সচেতন তিনি। বলেছেন, “কবিতার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকা চাই। কাব্যগুণ, ছন্দ, মিল।”[৮] আরও বলেছেন, “কবিতায় মিল থাক্ আর না-ই থাক্, ছন্দ সর্বদা থাকা চাই।”[৯] ছন্দ সম্পর্কিত তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হল ‘কবিতার ক্লাস।’ এই গ্রন্থে তিন রকমের ছন্দের কথা তিনি স্বীকার করেছেন — অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত।

চিত্রকল্প : চিত্রকল্প কবিতার একটি অমূল্য সম্পদ। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা সম্পর্কেও তা পরম সত্য। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প দু’ভাবে পাওয়া যায় — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প এবং ভাবাশ্রয়ী চিত্রকল্প। কবিতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে কবির অব্যক্ত চেতনা, কবির নিজস্ব বক্তব্য। অতএব চিত্রকল্প কবির মানসিকতার উন্মোচনে সহায়তা করে। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প মানে কেবলই দৃশ্যের বর্ণনা নয়, চিত্রকল্প শ্রুতিযোগ্য-স্পর্শযোগ্য-ঘ্রাণপ্রধানও হতে পারে। যেমন —

১. “ঝানু আকাশ ঝুঁকে পড়ে অবাক।” (“কাঁচ রোদ্দুর, ছায়া অরন্য”, ‘নীলনির্জন’)

‘ঝানু আকাশ’ এখানে দৃশ্যকে প্রতীকায়িত করছে। অর্থাৎ এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত।

ইন্দ্রিয়গম্য অনুভূতিই চিত্রকল্পের শেষ কথা নয়। ইন্দ্রিয়ময় জগতের বাইরে গিয়ে পাঠক যখন তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটি উপলব্ধি করতে পারে, তখনই চিত্রকল্প সৃষ্টিতে একজন কবির সার্থকতা প্রমাণিত হয়। সময়-সমাজ-মানুষ নীরেন্দ্রনাথের কবিতার ভাবকেন্দ্রে সর্বদাই বিরাজমান। চিত্রকল্প

নির্মাণেও সেগুলি মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাঁর কবিতায়। বিপর্যস্ত সমাজের ভয়াবহ রূপটি তাঁর কবিতায় কীভাবে চিত্রকল্প-রূপ পাচ্ছে, তা দেখে নেওয়া যেতে পারে —

"পাহাড়টিকে

মস্ত একটা ময়াল সাপের মতন

আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে যে

সরকারি সড়ক।" ("ঈশ্বরের মুখোমুখ", 'যাবতীয় ভালোবাসাবাসি')

কবি তাঁর সমকালীন বিশ্বসভ্যতার কুৎসিত ভয়ঙ্কর রূপটি এখানে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'ময়াল সাপ' এখানে সমাজ ও সভ্যতার ভয়াল রূপের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

অতএব বোঝাই গেল চিত্রকল্পের অভিঘাত কেবল ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক হয় না। তা ব্যাপক অর্থে ইন্দ্রিয়াতীত ব্যঞ্জনাকে বহন করে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র রূপের পরিচয় দেয়। এজরা পাউন্ড-এর একটি উক্তি মনে পড়ে যাচ্ছে, "An image that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time."[১০] চিত্রকল্পই কবিকে নিত্য নতুন সৃষ্টিতে নিত্য নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। এ বিষয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এক অভিনব দৃষ্টান্ত গড়েছেন বাংলা কবিতার জগতে।

তথ্যসূত্র :

১. তরুণ মুখোপাধ্যায় : "একটি প্রতিবাদী কবিতার জন্ম", নীলনির্জন কবি নীরেন্দ্রনাথ, অচিনপাখি প্রকাশন, নদিয়া, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ৫৫

২. সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় : "সাক্ষাৎকার", 'কবি নীরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধায় সমীক্ষায়', এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১০২-১০৩

৩. পিনাকেশ সরকার : 'কবির কবিতা কবির গদ্য', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ১২২

৪. তরুণ মুখোপাধ্যায়, "প্রেমিক কবি নীরেন্দ্রনাথ", 'নীলনির্জন কবি নীরেন্দ্রনাথ', অচিনপাখি, নদীয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯ ডিসেম্বর, পৃ. ২২

৫. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : "লালপরি নীলপরি'র জন্য শুভেচ্ছা", লালপরি নীলপরি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শিশুসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, ১৪২৪, বর্ষ ১৬, সংখ্যা-১৮, পৃ. ৫

৬. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : "কবিতাই আমার মাতৃভাষা", সাক্ষাৎকার, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, পৃ. ১৭০

৭. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকার, কোরক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪০৮, পৃ. ১৭৭

৮. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "কবিতার ক্লাস", গদ্যসমগ্র ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৮, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৮

৯. তদেব, পৃ. ১৮

১০. Ezra Pound, 'A FEW DON'TS BY AN IMAGISTE', Poetry, 1913, Page – 200

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক কবিতার ধারায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার সামগ্রিক মূল্যায়ন

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ভারত তথা বিশ্বের আর্থ—সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক রক্তক্ষয়ী যন্ত্রণাময় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধে সাম্যবাদীদের আন্দোলন গোটা পৃথিবীতে আলোড়ন জাগিয়েছিল, তা সাহিত্য-মাধ্যমে হোক বা বাস্তবের মাটিতে। চারের দশকে দেশের বুকে একের পর এক ঘটে চলা নানারকম রাজনৈতিক টানাপোড়েনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতেই এই দশকের প্রধান কবিরা সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন।

চারের দশকের অধিকাংশ কবি ছিলেন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। কাজেই সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষকে খুব কাছ থেকে জানার ও বোঝার সুযোগ হয়েছিল তাঁদের। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও কলেজ জীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানা পত্র—পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু কাকে বলতেন ‘খবুরে কাগুজে কবি।’[১]

চারের দশকে কেবল সমাজ—বিপ্লবের কবিতাই রচিত হয়নি, ব্যক্তি—আবেগের কবিতাও রচিত হয়েছে। সাম্যবাদী কবিরাও লিখেছেন কখনও কখনও। অন্তর্মুখী—ভাবের কবিতা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও কিছু লিখেছেন।

স্রোতের গোপন টানে ভেসে যায় পিতলের ঘড়া।

অথচ বেদনা তার থেকে যায়। তাই বসুন্ধরা

কেঁপে ওঠে ফাল্গুনের ঝড়ে।

মনে পড়ে, মনে পড়ে, এখনও তোমাকে মনে পড়ে। (“মনে পড়ে”, ‘যাবতীয় ভালবাসাবাসি’)

চারের দশকের কবিদের মতই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাব্যভাষায়ও এক সরলতা লক্ষণীয়। তুলনায় তিনের দশকের কবিদের কাব্যভাষা একটু দুরূহ। '...তিরিশের বেশ কয়েকজন প্রধান কবির কাব্যভাষায় যে সত্যিই একটু দুরূহতার, বা বলা যেতে পারে মনন ও বৈদগ্ধ্যের চমক সৃষ্টি করবার একটু প্রবণতা ছিল তা চল্লিশের কবিতায় দেখা গেল না।'[২]

উত্তরকালের কবিতার ধারায়ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রাসঙ্গিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা রয়ে গেছে। তিনি যেহেতু মানুষের কবি, তাই তাঁর অধিকাংশ কবিতাই জনচেতনা-মুখর। আটপৌরে ও গদ্যভাষায় লেখা দীর্ঘ ও আখ্যানধর্মী কবিতাগুলির মাধ্যমে কবি সাধারণ মানুষের অনেকখানি কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবির এইরূপ কবিতা-রীতির প্রভাব তাঁর উত্তরকালীন কবিদের মধ্যেও দেখতে পেয়েছি আমরা। এদিক দিয়ে জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, পিনাকী ঠাকুর, শিবাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর যথার্থ উত্তরসূরী হয়ে উঠেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. মধুশ্রী সেন সান্যাল, "সাক্ষাৎকার", 'কবি নীরেন্দ্রনাথ, যাপনে জিজ্ঞাসায়', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা : ৩২১

২. সুমিতা চক্রবর্তী, "চল্লিশের কবিতা", 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১৫৫

উপসংহার

একদিকে তিনের দশকের পাশ্চাত্যপন্থী কবিতার ধারা, অন্যদিকে পাঁচের দশকের আত্মগত কবিতার ধারা, আর এই দুই ধারার মাঝামাঝি অবস্থান করছে চারের দশকের সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনামূলক কবিতার ধারা। যদিও পাঁচের দশকের আত্মচেতনামূলক কবিতার ধারাটির পূর্বসূত্র চারের দশকে পথচলা শুরু করা কিছু কবির কবিতায় ধরা পড়ে। অপরপক্ষে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাব্য-কবিতাগুলি ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখের বিন্দুগুলির সঙ্গে তাঁর সামাজিক সত্তার সমন্বয়ে এক অপূর্ব দ্যুতিময়তার সৃষ্টি করেছে যেন চারের দশকের কবিতার ধারায়। সাম্যবাদে আস্থা থাকলেও[১] নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কখনও সরাসরি কোনো দলীয় রাজনৈতিক চেতনার প্রচার করেননি তাঁর কোনো কবিতায়। তিনি সময়ের কবি, মানুষের কবি। সমকালীন বিধ্বস্ত সমাজ ও সভ্যতার স্বরূপটিকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যেভাবে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, একজন মানব-দরদী কবি হিসাবে চল্লিশের কবিতার ধারায় এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে গেছেন তিনি।

তথ্যসূত্র :

১। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকার, 'কোরক', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, পৃষ্ঠা : ১৮০

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

১। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'কবিতা সমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, অগাস্ট ২০২২

২। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'কবিতা সমগ্র ২', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৬

৩। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'কবিতা সমগ্র ৩', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৬

৪। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'কবিতা সমগ্র ৪', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০০

৫। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'কবিতা সমগ্র ৫', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, অগাষ্ট ২০১৮

৬। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'কবিতা সমগ্র ৬', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৮

৭। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'কবিতার ক্লাস', নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাদেশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০১৩

৮। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গদ্যসমগ্র ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৮

৯। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'গদ্যসমগ্র ২', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯

১০। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নীরবিন্দু (অখণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬

১১। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ, ২০১৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অপর্ণা পাল, ‘চল্লিশের চালচিত্রে দুই কবি’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৯

২। অরুণ মিত্র, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, “সুভাষ মুখোপাধ্যায়”, ‘লেখকের মুখোমুখি’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে’জ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯

৪। অরুণ সেন, ‘কবি অরুণ মিত্র’, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬

৫। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘আধুনিক কবিতার ইতিহাস’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৬

৬। অশ্রুকুমার সিকদার, ‘আধুনিক কবিতার দিগবলয়’, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৯

৭। অশোক ভট্টাচার্য, ‘কবি সুকান্ত’, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৫

৮। অশোকবিজয় রাহা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৮৪

৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য’, বুকল্যান্ড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫

১০। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০-২০১১

১১। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯

১২। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, ‘সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৮

১৩। উত্তম দাশ, ‘শতাব্দীর বাংলা কবিতা’, মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, জানুয়ারি ২০০১

১৪। কমল মুখোপাধ্যায় (সম্পা), ‘কবি অরুণ মিত্র’, শিলীন্ধ্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০২

১৫। কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, ‘আমার বাবা কবি নীরেন্দ্রনাথ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০২৪

১৬। গোরা সিংহ রায়, ‘কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২

১৭। গৌতম বসু (সম্পা), ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৮। জগদীশ ভট্টাচার্য, ‘আমার কালের কয়েকজন কবি’, ভারবি, কলকাতা, জুলাই ২০১৪

১৯। জহর সেনমজুমদার, “বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ”, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮

২০। জয় গোস্বামী, কবিতা সংগ্রহ ১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৫৯

২১। জয় গোস্বামী, কবিতা সংগ্রহ ৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১০

২২। জয় গোস্বামী, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০২১

২৩। জীবনানন্দ দাশ ‘কবিতার কথা’, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, দশম সংস্করণ, মাঘ ১৪১৩

২৪। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ‘কল্লোলের কাল’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮

২৫। তরুণ মুখোপাধ্যায়, ‘কবি নীরেন্দ্রনাথ : কলকাতার যিশু’, সারঙ্গ প্রকাশনী, হাওড়া, প্রকাশ,

২৬। তরুণ মুখোপাধ্যায়, ‘নীলনির্জন কবি নীরেন্দ্রনাথ’, অচিনপাখি প্রকাশন, নদিয়া, ডিসেম্বর ২০১৯

২৭। তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 'আধুনিক বাংলা কাব্য', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৮৪

২৮। দিনেশ দাস, 'অসংগতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

২৯। দিনেশ দাস, 'দিনেশ দাসের কাব্যসমগ্র', মনীষা, কলকাতা, ১৯৮৪

৩০। দিনেশ দাস, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০১৪

৩১। দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০১৩

৩২। পিনাকী ঠাকুর, 'আমরা রইলাম', বিজল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৩৩। পিনাকী ঠাকুর, কবিতা সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫

৩৪। পিনাকী ঠাকুর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬

৩৫। পিনাকেশ সরকার, 'কবির কবিতা কবির গদ্য', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১২

৩৬। পিনাকেশ সরকার 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৫

৩৭। বাণী রায়, 'সপ্তসাগর', কমলা বুক ডিপো, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬১

৩৮। বিষ্ণু দে, 'এলিঅটের কবিতা', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

৩৯। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, মে ২০১৯

৪০। বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নিউ এজ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৫৯

৪১। বুদ্ধদেব বসু, ‘প্রবন্ধ-সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

৪২। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ‘কবিতা সংগ্রহ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬

৪৩। মধুশ্রী সেন সান্যাল, ‘কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে, জিজ্ঞাসায়’, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

৪৪। মাহবুবুল হক, ‘তিনজন আধুনিক কবি : সমর সেন, সুভাষ মুখো‘কবি অরুণ মিত্র’, শিলীন্ধ্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০২

৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “চিঠিপত্র” (একাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৪

৪৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যের পথে’, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২

৪৭। শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ‘সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৮

৪৮। শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ‘কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়’, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

৪৯। শাওন নন্দী, ‘পঞ্চাশ কবিতার নয়াচর’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১২

৫০। শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, ‘ইস্কুল অফিস ছাপাখানা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯

৫১। শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, ‘রূপোর কলম সোনার মেয়ে’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

৫২। শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮

৫৩। সমর সেন, ‘সমর সেনের কবিতা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, মে ২০১৯

৫৪। সমর সেন, ‘বাবুবৃত্তান্ত’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯১

৫৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা কবিতার কালান্তর’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮

৫৬। ‘সাত দশক—সমকাল ও আনন্দবাজার’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯

৫৭। সুকান্ত ভট্টাচার্য, ‘সুকান্ত রচনাসমগ্র’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৯

৫৮। সুকুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, দ্বিতীয় খণ্ড, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

৫৯। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ‘কাব্য সংগ্রহ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৬০

৬০। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ‘সংবর্ত’, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

৬১। ‘সুবোধ সরকারের কবিতা’, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫

৬২। সুবোধ সরকার, কবিতা সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪

৬৩। সুবোধ সরকার, কবিতা সমগ্র ২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬

৬৪। সুবোধ সরকার, ‘প্রতিবাদের কবিতা’, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৪

৬৫। সুবোধ সরকার, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২

৬৬। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সংগ্রহ ১, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৪

৬৭। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সংগ্রহ ২, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৪

৬৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সংগ্রহ ৩, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪

৬৯। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সংগ্রহ ৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৭

৭০। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সংগ্রহ ৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪

৭১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'চিঠির দর্পণে', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৬

৭২। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'টানাপোড়েনের মাঝখানে', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৪

৭৩। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'ভূতের বেগার', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৫৪

৭৪। সুমিতা চক্রবর্তী, 'আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, বইমেলা ২০১৬

৭৫। সুমিতা ভট্টাচার্য, 'বাণী রায়', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪

৭৬। হিমবন্ত চট্টোপাধ্যায়, 'বিষণ্ণতাবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', বিবেক ভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৯

৭৭। Ezra Pound, 'A FEW DON'TS BY AN IMAGISTE', Poetry, 1913

৭৮। M.H.Abrams, 'A Glossary of Literary Terms', Cengage Learning India Private Limited, Delhi, 2017

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

১। 'অনুষ্টুপ', সমর সেন বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮

২। 'অন্য বর্তিকা', ১৪ই অক্টোবর ১৯১২

৩। 'আজকাল', শারদীয় ২০২৩

৪। 'এবং মুশায়েরা', কবি ও কবিতা বিশেষ সংখ্যা, শারদীয় ১৪০৮

৫। ‘কবিতা প্রতিমাসে’, নীরবিন্দু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১০০, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৪

৬। ‘কবিতার সাম্রাজ্য বিশ্বজুড়ে’ পত্রিকা, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ

৭। ‘কবিতীর্থ’, মাঘ ১৪০৮

৮। ‘কবিতীর্থ’, বত্রিশ বর্ষ, বৈশাখ ১৪২১

৯। ‘কোরক’, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮

১০। ‘জিজ্ঞাসা’(নব পর্যায়), সপ্তত্রিংশ বর্ষ, প্রথম চতুর্থ সংখ্যা, ২০২০-২১

১১। ‘তবু একলব্য’, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিশেষ সংখ্যা, ২০১৯

১২। ‘ত্রিষ্টুপ’, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অগাস্ট ২০০৯

১৩। ‘দেশ’, ১৯৯৬

১৪। ‘দেশ’, অক্টোবর ২০১৭

১৫। ‘দেশ’, মে ২০২৪

১৭। ‘নৌকো’ সাহিত্যপত্র, বিশেষ বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৯

১৮। ‘পরম্পরা’, দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

১৯। ‘পরিচয়’, নভেম্বর ১৯৮৪

২০। ‘পরিচয়’, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ৭-১২ সংখ্যা, ৭৩ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি–জুলাই ২০০৪

২১। ‘বইয়ের দেশ’, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩

২২। ‘বর্ণমালা’, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বইমেলা ২০১৯

২৩। ‘মৈত্রী’, মহালয়া ২০১৩

২৪। ‘মৌরীফুল’ নবপর্যায়, ১৪১৯

২৫। ‘যুগান্তর’, ২০১৩

২৬। 'লালপরি নীলপরি', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শিশুসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, ১৪২৪

২৭। International Journal of Humanities and Social Science Studies (IJHSSS), Volume-3, Issue-1, July 2016